OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 468 - 477
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 468 - 477
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা খ্রিস্টসংগীতের দুটি লোকায়ত ধারা : বাউল ও ভাটিয়ালি খ্রিস্টগান

শাশ্বতী বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (স্বশাসিত), কলকাতা
Email ID: moon.saswatibiswas97@gmail.com
0009-0002-2740-2504
এবং
ড. শ্রুতি গোস্বামী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রাজা প্যারীমোহন কলেজ
Email ID: shruti.surela@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Folk, Christian, Prayer, Hymn, Tradition, Christian Baul, Christian Bhatiyali, Mysticism.

Abstract

The objective of this article is to explore how the two folk music traditions of Bengal—Baul and Bhatiyali—have been incorporated into Khristasangeet (Christian devotional songs) written in Bengali.

Initially, foreign missionaries translated prayers and hymns from foreign languages into Bengali with the target of spreading Christianity and promoting religious teachings. When Bengali Christians began composing Khristasangeet, the influence of Bengali culture reflected in the musical structures. Several collections of Christian songs contain lists of compositions based on Bengali musical traditions. Among these are songs composed in the Baul style or based on Baul melodies, which may be identified as Khrista Baul. Sometimes the mystical elements and spiritual philosophy of Baul tradition have been integrated with Christian theology in these songs. The present study includes fieldwork in the Chapra region of Nadia district in this context. Another folk music tradition of Bengal is Bhatiyali. Its structure, themes, and metaphors have been adapted to Christian themes, giving rise to a form that may be termed Khrista Bhatiyali.

This research article has tried to figure out and analyse how the close relationship between religion and culture has established itself across differences of time and place, and how community-specific rituals and practices have fostered harmony and synthesis in folk life.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 468 - 477
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

খ্রিস্টধর্ম বাংলার সংস্কৃতিতে এসেছিল সম্পূর্ণ নব্য এক সংযোজনের মতো, যদিও ধর্মটি বাংলায় এসেছে এদেশের ইতিহাসের হিসেবে মধ্যযুগে— খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে। তবে, এদেশে এই ধর্মের প্রসার, সংস্কৃতিতে নিজস্ব স্থান অধিকার করে নেওয়ার বিষয়টি শুরু হয়েছে অনেক পরে। প্রথমদিকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে খ্রিস্টধর্মের প্রচার করতেন রোমান ক্যাথলিক মিশনারিরা প্রায় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এবং এই সময় এদেশীয় যে মানুষগুলির মধ্যে এই ধর্মের প্রসার ও ধর্মান্তরণের চেষ্টা করা হত, তাঁরা ছিলেন এদেশের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ, কখনো কখনো ক্রীতদাস। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ও নানা ধর্মের উপাসনার অন্যতম উপাদান সংগীত। খ্রিস্টধর্মও এর ব্যতিক্রম নয়।

উনিশ শতকে বাংলায় খ্রিস্টধর্মের প্রটেস্টান্ট শাখার ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরণের ধারা যখন গতিপ্রাপ্ত হচ্ছিল, তার আগে পর্যন্ত বাংলায় খ্রিস্টীয় উপাসনা সংগীত ছিল প্রধানত বিদেশি পাদ্রি ও ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা অনূদিত গান; বিশেষ করে যখন বাংলায় পোর্তুগিজ রোমান ক্যাথলিক পাদ্রিদের ধর্মপ্রচারের কারণে এদেশের মানুষ ধর্মান্তরিত হতে শুরু করেন, সেই সময়। এই পোর্তুগিজ ধর্মপ্রচারকগণ বা পাদ্রিগণ বাংলায় খ্রিস্টসংগীতের প্রবর্তন করেছিলেন এবং ফাদার হস্টেনের একটি প্রবন্ধে পাওয়া যায় যে, পাদ্রি সান্তুচ্চি বাঙালি ধর্মপ্রচারকদের কার্যাবলী বিষয়ে লিখেছেন, নব্য ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের প্রতি কর্তব্যপরায়ণভাবে পাদ্রিরা সপ্তদশ শতকে শব্দসংকলন ও ব্যাকরণের পাশাপাশি রচনা করেছিলেন কিছু প্রার্থনা ও স্বীকারোক্তিমূলক (confessional) রচনা।[১] বস্তুত এই রচনাগুলি বাংলার মৌলিক কোনো রচনা নয়, বরং বিদেশি ভাষা থেকে অনূদিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খ্রিস্টীয় প্রার্থনামাত্রেই যে গান, এমন নয়। তাই, দৃষ্টান্ত-অধুনালুপ্ত এই প্রার্থনাগুলি গান হিসেবে বা গদ্যে— উভয়তই রচিত হতে পারে।

ষোড়শ শতকেই প্রথম বাংলা খ্রিস্টসংগীতের লেখ্য নিদর্শন পাওয়া যায় দোম আন্তোনিও রচিত *ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ* এবং মানো এল দ্য অস্‌সুম্পসাঁও রচিত *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* গ্রন্থে। *ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ*-এর একেবারে শেষে পদ্যাকারে একটি লেখা পাওয়া যায়, তবে এই লেখাটি গান কিনা তা ঠিক স্পষ্ট নয়। মানো এলের *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* গ্রন্থে পদ্যাকারে পাওয়া যায় একটি গান—

হে বাবা জেসাস
বালক নিরমল
বিবি মারিয়ার উদরের
সিধি ধরমো ফল
আমার দএয়ার জেসাস
হে বাবা জেসাস
হে সোনার বাবা
তোমাকে আমি লই
করি তোমার সেবা
আমার দএয়ার জেসাস।।

উক্ত গানটি দীর্ঘদিন গাওয়া হত এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কোনো খ্রিস্টানের রচিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালে বাংলার সি এন আই (CNI) চার্চের প্রার্থনা সংগীত সংকলন *ধর্মগীত*-এ এই গানটি স্থান পেয়েছে; যদিও এই গ্রন্থের মুখবন্ধ অংশে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এটি। পরবর্তীকালে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে নিঃসন্দেহেই খ্রিস্টীয় সংগীত রচনার ধারা অব্যাহত ছিল, তবে এর যথাযথ নিদর্শন পাওয়া যায় উনিশ শতকে শ্রীরামপুর মিশনে ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির ধর্ম প্রচার ও ধর্মান্তরণের কাজ শুরু হওয়ার পর শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে খ্রিস্টসংগীত গ্রন্থ প্রকাশের পর। ১৮১৮ সাল নাগাদ *য়িশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত* নামক একটি তিন খণ্ডের গানের বই প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটির প্রথম দু-টি খণ্ড ছিল যথাক্রমে বিদেশি সুরের গান ও বিদেশি মিশনারি চেম্বারলেন সাহেবের রচনা করা গানের সংকলন। শেষ খণ্ডটিতে ছিল এদেশীয় সুর— বিশেষত বাঙালি সুরের বা স্বরের কিছু খ্রিস্টীয় গান। যখন এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের গান সম্পর্কে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 468 - 477
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উক্ত ধরনের পরিচিতি গ্রন্থের শুরুতেই দেওয়া আছে, তখন অনুমান করা যায় যে, এই গানগুলির মধ্যে বাংলার লোকায়ত সুরের গান যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান ছিল। তাই পরবর্তীকালে যখন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে খ্রিস্টসংগীতের মধ্যে নানাবিধ আঞ্চলিক সংগীতের প্রভাব পড়েছে বলে লক্ষ করা যায়, তখন একথাও মনে হয় যে, এই লোকায়ত গানের প্রতিফলন খ্রিস্টসংগীতে পড়েছে এমন সময় থেকে, যখন খ্রিস্টসংগীত রচনা বাঙালির মাধ্যমে বাংলার বুকে শুরু হয়েছিল।

বাংলার বিবিধ লোকায়ত আদলের গানের মধ্যে স্বল্পালোচিত দু-টি ধারার খ্রিস্টসংগীত নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে। এই দু-টি লোকসংগীতের ধারা হল বাউল এবং ভাটিয়ালি আঙ্গিকের বা সুরের খ্রিস্টসংগীত। বাংলা খ্রিস্টসংগীত সংকলনগুলির মধ্যে অনেক গানের উল্লেখই পাওয়া যায় বাউল সুরের গান, বাউল গান বা ভাটিয়ালি সুরের গান ইত্যাদি পরিচয়যুক্ত। আবার কোনো লোকায়ত সুরের গান বা আঙ্গিকের গান হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি, এমন গানেও লৌকিক সুরের ছাপ পড়ে গেছে, এমন দেখা যায়। আবার, শুধুই সংগীত সংকলনগুলিতে স্থান পেয়েছে এমন গান ব্যতিরেকেও আরও বিবিধ খ্রিস্টীয় গান আছে, যা খ্রিস্টীয় বাউল বা ভাটিয়ালি ধরনের গান হিসেবে মানুষের মধ্যে গাইবার রীতি আছে।

বাউল গানে থাকে মরমিয়া দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রতিফলন এবং তার প্রকাশ অত্যন্ত আন্তরিক লোকসুরে। মানুষের মনেই পরমেশ্বরের অবস্থান এবং তাঁর খোঁজই বাউল সাধনার প্রধান দিক, যা বারংবার বাউল মহাজনেরা বলে গেছেন তাঁদের গানগুলিতে। বস্তুত, ইসলামী মারিফতি সাধনা ও ভারতীয় একাত্মবাদী দর্শন বা বেদান্ত দর্শনের মিশেলে ভারতবর্ষে সুফিবাদের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, বাংলায় যার প্রকাশ বাউল ধর্ম ও সংস্কৃতি। তারই পাশাপাশি মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাউল ধর্ম ও সাধনার মধ্যে বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম, সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম ও তন্ত্রের প্রভাব পড়েছে এবং তা ফুটে ওঠে বাউল গানগুলিতে। স্বভাবতই, যখন খ্রিস্টধর্মের মধ্যে বাউল গানের প্রভাব পড়ে এবং সেখান থেকে খ্রিস্টীয় বাউল গানের উদ্ভব হতে থাকে, তখন বাউল দর্শনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়ে যায়। এমনই বিশেষত্ব দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চাপড়া অঞ্চলের খ্রিস্টমণ্ডলীর একজন সংগীত শিল্পী ও সংগীত রচয়িতা শামিয়েল মণ্ডলের গানে।

বাউল সাধনা ও তৎকেন্দ্রিক সংগীত সম্পর্কে একটি ধারণা করা হয়ে থাকে যে, বাউল সাধকেরা বা সংগীত রচয়িতারা বা মহাজনেরা নিজেদের উপলব্ধি ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বাউল গান রচনা করেছেন এবং এই গানগুলিই বাউল গায়কেরা গেয়ে থাকেন কোনো আসরে, আখড়ায় বা অনুষ্ঠানে। এই ধারণা সম্পূর্ণত ভ্রান্ত নয়, তবে বাউল গানের বিশেষ দার্শনিকতার প্রকাশ ঘটে প্রশ্নোত্তরী বাউল গানে। বাউল আসরে এই গানের উপস্থাপনার বিশেষত্ব হল এই আসরে দু-টি পক্ষ থাকে— অনেকটা কবিগানের লড়াইয়ের মতো; তবে এই দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র বাদ বিবাদ হয় না অথবা তার কারণে কোনো পক্ষই চরম আক্রমণাত্মক পন্থা গ্রহণ করেন না। এই দু-টি পক্ষ হল গুরু ও শিষ্য। স্বভাবতই, গুরু শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বের আলোচনা প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়, তাই এ গানে রেষারেষি ও একে অপরকে আক্রমণের চেয়ে তত্ত্বালোচনা বেশি গুরুত্বের জায়গায় থাকে। একপক্ষ প্রশ্ন করেন ও অপরপক্ষ তার উত্তর দেন। এভাবে ধাপে ধাপে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে প্রশ্নোত্তরী বাউল গান পরিবেশিত হতে থাকে। সভায় বাউল গান পরিবেশনের পূর্বে বাজনা দিয়ে আবহ তৈরি করা হয় এবং গানের ভূমিকা হিসেবে নবী, চৈতন্য বা মাতৃবন্দনা গাওয়া হয়।[২]

এই প্রশ্নোত্তরী বাউল বা তত্ত্ব বাউল গানের পদগুলিকে গুরুপদ ও শিষ্যপদ, নিহার ও শিক্ষা, উঁচুপদ ও নিচুপদ, শিক্ষা ও দৈন্য বা রাগদৈন্য ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করা হয়। ধারাবাহিকভাবে গানগুলি বিষয় অনুসারে উচ্চস্তরে উঠতে থাকে। উক্ত দুই পক্ষ তাঁদের প্রতিনিধি গায়ককে নানাভাবে সাহায্য করেন, তবে এই গানের মধ্যে প্রতিপক্ষকে কোনোভাবেই হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা থাকে না। একারণেই গানের শেষে দেখা যায় গুরু ও শিষ্যের মিলন ঘটছে এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে আলোচিত পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়।[৩] সুতরাং, বাউল গানের তত্ত্বকেন্দ্রিক আলোচনা এই প্রশ্নোত্তরী বাউল বা তত্ত্ব বাউল অথবা বাউল পাল্লাগানের বিশেষত্ব; তাছাড়া কবিগানের পক্ষ-প্রতিপক্ষের ধরনটি থাকলেও এই বাউল গানে কটু-বাক্যে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার কোনো প্রবণতাই নেই। বরং, এই বাউল গানের প্রধান উদ্দেশ্য প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞানের এক উন্নত স্তরে পৌঁছোনো।

শক্তিনাথ ঝা তাঁর *বস্তুবাদী বাউল* গ্রন্থে লিখেছেন যে, বাউল পদকর্তাদের খাতায় প্রশ্নোত্তরের মতো করে, অর্থাৎ গুরুপদ ও শিষ্যপদ ক্রমানুসারে লেখা আছে। অনেক সময় দেখা যায় পদকর্তারা সওয়াল জবাবের রীতিতে গান

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 468 - 477
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পর্যায়ভিত্তিকভাবে সাজিয়েছেন। আবার পালা রচয়িতা নিজের রচিত পদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পদকর্তার রচনা করা পদও তাঁর পালায় ব্যবহার করেন। কোনো পদকর্তার প্রশ্ন ও উত্তর— উভয় পদই একটি পালায় পালা রচয়িতা ব্যবহার করলে সাধারণত একই পদকর্তার শিষ্যপদ ও গুরুপদ পরপর রাখা হয়ে থাকে।[৪]

তত্ত্ব বাউলের এই ধরনটির কথা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চাপড়া গ্রামের খ্রিস্টসংগীত শিল্পী, খ্রিস্টীয় কীর্তন ও বাউল গানের অন্যতম ধারক ও স্রষ্টা শামিয়েল মণ্ডলের কাছে জানা যায়। তিনি জানান যে, তাঁর রচিত একটি খ্রিস্টীয় তত্ত্ব বাউল পালা, যাকে পাল্লাগানও বলা হয়, তা আছে। তবে এই গানের কোনো উপস্থাপনা শোনা যায় না বর্তমানে এবং খ্রিস্টীয় তত্ত্ব বাউল গানের শিল্পী এখন প্রায় কেউই নেই। শুধু বোঝা যায়, এই গান গাইবার পদ্ধতি তত্ত্ব বাউলের মতোই। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই গানের কথায় বাউল গানের পূর্বসূত্র সুফিদর্শনের যোগ পাওয়া যায়।

সুফিরা হলেন ইসলাম ধর্মের মরমিয়া সাধক। কোনো প্রথাগত সাধনায় তাঁরা বিশ্বাসী নন, বরং সংস্কারমুক্ত ও উদার পন্থায় মানুষের মনের ভিতরেই পরমেশ্বরকে খুঁজে নেওয়ার সাধনা এঁদের। এই পথেই সুফিসাধনার মধ্যে কিছু স্তরের কথা বলা হয়— যেমন ফানা ফিল্লাহ্, ব্বকা বিল্লাহ্ ইত্যাদি। এই পরিভাষাগুলি একান্তই সুফি সাধনার সঙ্গে যুক্ত, এমনকী সরাসরি বাউল গানেও যে এই শব্দবন্ধের খুব প্রকাশ চোখে পড়ে, এমন নয়। কিন্তু শামিয়েল মণ্ডলের লেখা খ্রিস্টীয় পাল্লা গানে এই সুফি সাধনার অত্যন্ত গভীরের কিছু বিষয়, শব্দও চোখে পড়েছে। শামিয়েল মণ্ডলের লেখা খ্রিস্টীয় তত্ত্ব বাউলের তৃতীয় পদের প্রথম দু-টি পংক্তি—

ছিলাম আমি কল্পনার দেশে, আপনাকে আপনি জানা,
নিজেকে করে ফানা, ফানা ফিল্লায় গেলাম আমি মিশে।।

পদটির দ্বিতীয় তুকেই আবার দেখা যায় পদকর্তা শামিয়েল নিজের ‘পঞ্চতত্ত্বে’ মিশে থাকার কথা লিখেছেন—

যাহা আছে এ জগতে সব সৃষ্টি আমা হতে, অন্ধকার, ধূয়াকার,
শন্যকার (শূন্যকার), নিরাকার, জলাকার সবি আমাতে ছিল মিষে (মিশে),
আমি এই পাঁচ কারকে আশ্রয় করে ছিলাম আমি যুগ যুগ ধরে, এই পঞ্চ তত্ত্বে মিশে।।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *বঙ্গীয় শব্দকোষ* গ্রন্থে পঞ্চতত্ত্ব বলতে এর দু-টি অর্থ নির্দেশ করেছেন— পঞ্চমকার ও পঞ্চভূত। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন যে পঞ্চতত্ত্ব বলতে বোঝায় গুরুতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্ব।[৫] তবে, উক্ত পদে উল্লেখিত পঞ্চতত্ত্বের সঙ্গে পঞ্চভূতের আংশিক সাদৃশ্য পাওয়া গেলেও বিষয়টি খুব স্পষ্ট না হওয়ার কারণে বাউল গানের তাত্ত্বিক বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার্থেই যে এই শব্দের ব্যবহার কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

আবার, বাউল গানে মহাজন পদকর্তারা নিজের নাম রেখে ভণিতা করতেন যেভাবে, তেমনই খ্রিস্টীয় তত্ত্ব বাউল গানে শামিয়েল মণ্ডলের নামের ভণিতাও পাওয়া যায়। বাংলা খ্রিস্টীয় বাউল গানমাত্রেই তাতে ভণিতা পাওয়া যায় এমন নয়; কিন্তু সম্ভবত নদীয়ার উক্ত চাপড়া ও তৎসন্নিহিত তরণীপুর, বালিউড়া, আন্দুলিয়া প্রভৃতি জায়গায় বাউল সাধনা ও বাউল গানের চর্চা হওয়ায় বাউল গানের বিশেষত্বগুলি সম্পর্কে শামিয়েল মণ্ডল ওয়াকিবহাল আর সম্ভবত সেই কারণেই তাঁর লেখা পাল্লাগানের ভণিতায় নিজের নামকে ধরে রেখেছেন।

এই খ্রিস্টীয় বাউলগানের উপস্থাপনার নিদর্শন না পাওয়ার কারণে সামগ্রিকভাবে খ্রিস্টীয় তত্ত্ব বাউল গানের চিত্রটি পরিষ্কার হয় না, তবে শামিয়েল মণ্ডলের কথা থেকে বোঝা যায় যে, তত্ত্ব বাউল গানের উপস্থাপনা এবং খ্রিস্টীয় তত্ত্ব বাউল বা পালাগানের উপস্থাপনা সমধর্মী। তা সত্ত্বেও খ্রিস্টীয় তত্ত্ব বাউল গানের গ্রহণীয়তার অভাব ঘটছে, মানুষের কাছে গুরুগম্ভীর তত্ত্বালোচনার চেয়ে বাউল গানের সুরের মাধুর্য বেশি আকর্ষণীয়। তাই তত্ত্ব বাউল গানের চর্চা বর্তমানে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।

খ্রিস্টীয় বাউলগান বলতে কেবল তত্ত্ব বাউল ছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে রচিত বাউল গান বোঝায়। খ্রিস্টসংগীত সংকলনগুলিতে বিভিন্ন ধরনের খ্রিস্টসংগীত সংকলিত আছে যাদের বাউল, বাউলের সুর, বাউলাঙ্গ ইত্যাদি পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। কোনো পাল্লাগানের অংশীপদ এগুলি নয় এবং বাউলগানের সুর ও গায়নশৈলীই এই গানগুলির বিশেষত্ব।

খ্রিস্টীয় বাউল গানের বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে দেখা যায়, এই গানগুলি খ্রিস্টধর্মের পৌরাণিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু কিছু ঘটনাকে আধার করে ঈশ্বরের প্রতি বা যীশুর প্রতি আনুগত্য ব্যক্ত করে। সেই সঙ্গেই উল্লেখ করতে হয়, তাত্ত্বিক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 468 - 477
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দিক থেকে এই গানগুলি বাউল গানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, বরং আজকের দিনে জনপ্রিয় যে বাউল গানগুলি, তাদের প্রকাশভঙ্গি ও সুরের সঙ্গেই এই গানগুলির মিল।

খ্রিস্টীয় তত্ত্ব বাউল গানে শামিয়েল মণ্ডল যেমন ভণিতা রেখেছেন, তেমনই বাউল খ্রিস্টীয় গানে এই চাপড়া অঞ্চলেরই সংগীত রচয়িতা ললিতমোহন সরকার ভণিতা ব্যবহার করেছেন। ১৯৮৯ সালে লেখা তাঁর একটি বাউল গান—

ভবনদীর বানে তরী যাচ্ছে আমার ভেসে
দয়াল রক্ষা কর এসে।
১. মাঝি আমার ছিল ছয়জন, ছিলাম তাদের আশে
আমি তাদের ভালোবেসে।
বিপদ দেখে গেছে চলে, রইল না কেউ পাশে।।
২. হাঙ্গর কুমির আছে জলে, খাবার তল্লাসে
(আমায়) দেখছে সদা বিষে
যদি পড়ে যাই গো দয়াল, খাবে চক্ষের নিমিষে।।
৩. একে তো প্রবল বন্যা, ঝড়ের সঙ্গে মিশে
আবার পাহাড় পড়ছে ধসে।
ঘোর তুফানে ঘূর্ণিপাকে হারালাম সব দিশে।।
৪. বিপদে পড়িয়া আমি ডাকছি ঊর্ধশ্বাসে
কেউ যদি কেউ আসে
কেউ না শোনে আমার বচন, সবাই বসে হাসে।।
৫. অধীন ললিত বলছে যীশু নিজ গুণে এসে
(দয়াল) তুমি হালে বসে
আমার বেয়ে চল জীর্ণ তরী, উদ্ধার কর এসে।।

মানুষের জীবনে নানাবিধ সমস্যা, অসুবিধা, দুর্বিপাক, প্রতিবন্ধকতা আসে আর তার কারণ যে অনেকখানিই মানুষের নিজেরই ইন্দ্রিয়বশবর্তিতা— এই বিষয়টিকে চিহ্নিত করেছেন ললিতমোহন সরকার এবং নিজের নাম গানের শেষ স্তবকে রেখেছেন ভণিতা আকারে, মহাজনেরা বাউল গানে যেভাবে ভণিতা রাখেন, সেভাবেই। বোঝা যায়, গানটিকে বাউলদর্শনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে রচনা ও নির্মাণ করা হয়েছে। গানে 'ভবনদী', 'ছয় জন মাঝি', 'ঘূর্ণিপাক', 'জীর্ণ তরী' ইত্যাদি শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে, যাদের অন্তর্নিহিত অর্থগুলি ইহজীবনকেন্দ্রিক। তবে, বাউল গানে 'সাঁই' বা 'মনের মানুষ' প্রসঙ্গ যেভাবে আসে, এই গানে সেই স্থানে আশ্রয় করা হয়েছে যীশুকে। স্বভাবতই, এই গানের সুর যে বাউল সুর, তার উল্লেখের পাশাপাশি গানের বিষয়বস্তু ও ভণিতার দিক থেকে এর খ্রিস্টীয় বাউল অভিধা স্বীকৃত হয়।

যেমন, নদীয়া জেলার চাপড়া গ্রামেরই একজন খ্রিস্টসংগীত রচয়িতা ও গায়ক দিলীপ মণ্ডল একটি খ্রিস্টবাউল গান রচনা করেছেন। গানটি এরকম—

ভালোবেসে এই মানুষকে পাঠালে নিয়ে পুত্রকে
যে তাহারে বিশ্বাস করে, মরণ তার হবে না।।
আমি পথ সত্য জীবন, সত্য পথের এই ঠিকানা
আমা দিয়া না আসিলে পিতার নিকট কেউ যাবে না।।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 468 - 477
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বোঝাই যাচ্ছে, যীশুর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আনুগত্য দ্বারা পরমেশ্বরকে লাভ করা যায়— এই বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে গানে। উল্লেখ্য, গানটির সুর হিসেবে বিখ্যাত বাউল গান 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে' গানের সুর ব্যবহার করেছেন সংগীত স্রষ্টা দিলীপ মণ্ডল।

বাংলায় অনেকদিন ধরেই খ্রিস্টসংগীতের মধ্যে বাউলের সুর বা বাউলাঙ্গের গান আছে। উনিশ শতকে বাংলায় ব্যাপটিস্ট খ্রিস্টান মিশনারিদের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মান্তরণ শুরু হওয়ার পর শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল *যিশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত* শীর্ষক একটি গ্রন্থ, যা তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। এই তিন খণ্ডের শেষ খণ্ডে এদেশীয় স্বরের অর্থাৎ সুরের গান সংকলিত ছিল বলে গ্রন্থের আখ্যাপত্র থেকে জানা যায়। এ বিষয়ে অনুমান করা খুব ভ্রান্ত হবে না যে, এই এদেশীয় স্বরের গানের মধ্যে বাউল সুরের গানও ছিল।

বাঙালির উদ্যোগে বাংলা ভাষার খ্রিস্টসংগীত সংকলনের মধ্যে উনিশ ও বিশ শতকের বেশ কিছু খ্রিস্টসংগীত সংকলন ছিল, যেখানে গানগুলির শিরোদেশে গানের রাগ, তাল অথবা বিশেষ সুর বা অঙ্গের উল্লেখ করা হত। অনেকসময় দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন সংকলন গ্রন্থে কোনো আকটি গানের পরিচিতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। এই পরিচিতির বিভিন্নতা লক্ষ করা যায় নানা লোকসুরের খ্রিস্টসংগীতে। এমনই একটি খ্রিস্টসংগীত সংকলন মহেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত *খ্রীষ্ট-সংগীত*। এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৫ সালে। ১৯৩৩ সালে এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটিতে বাউল সুরে গাওয়া খ্রিস্টসংগীত কিছু কিছু সংকলিত ছিল। এই গ্রন্থের ১২৩ সংখ্যক 'চেতনা ও আহ্বান' শীর্ষক পর্যায়ভুক্ত গানটি ১৮৬০ সালে যাকোব মণ্ডলের রচনা করা গান। গানটির শিরোদেশে উল্লেখ করা হয়েছে এটি 'বাউল সুরের গান'। গানটি *খ্রীষ্ট-সংগীত* গ্রন্থে পাওয়া যায় এভাবে—

যীশু পরম ধন!
তাঁরে যত্ন কর আমার মন।
প্রভু ছাড়িলেন স্বর্গস্থান, আইলেন মর্ত্ত্য ভুবন,
ও মন তোমারি কারণ,
তিনি নরের জন্যে নরদেহ করিয়াছেন ধারণ।
ও মন তোমার পাপের জন্যে গেৎশিমানী বাগানে
কত দুঃখ তাঁর প্রাণে,
ও মন তোমার মহাপাপের জন্যে, তিনি ক্রুশে করিলেন প্রাণ সমর্পণ।
যে জন বিশ্বাসে করে সাধন, সে পেয়েছে খৃষ্টধন,
সে ধন অমূল্য রতন, ঐ ধন অনন্তকাল থাকবে রে মন, তাহার ক্ষয় নাহি হবে কখন।

স্বভাবতই, গানটির কিছু কিছু অংশ এই বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি। পরবর্তীকালে বাংলার প্রটেস্টান্ট চার্চ সি এন আই বা চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়ার প্রার্থনা গ্রন্থ *ধর্মগীত*-এ এই গানটি সংকলিত হয়েছে। এই বইয়ে গানটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত—

যীশু পরম ধন!
তাঁরে যত্ন কর আমার মন।
১. প্রভু ছাড়িলেন স্বর্গস্থান, আইলেন মর্ত্ত ভুবন,
ও মন তোমারি কারণ,
তিনি নরের জন্যে নরদেহ ও মন করিয়াছেন ধারণ।
২. ও মন তোমার পাপের জন্যে গেৎশিমানী বাগানে
কত দুঃখ তাঁর প্রাণে,
ও মন তোমার মহাপাপের জন্যে, তিনি ক্রুশে করিলেন প্রাণ সমর্পণ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 468 - 477
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩. প্রভু যত্নের নিধি যত্নের ধন, তাঁরে ভক্তি কর আমার মন,
তবে পাইবে জীবন,
তাঁরে অযতন কৈলে রে মন, হবে নরকে তোমার গমন।
৪. যে জন বিশ্বাসে করে সাধন, সে পেয়েছে খৃষ্টধন,
সে ধন অমূল্য রতন, ঐ ধন অনন্তকাল থাকবে রে মন, তাহার ক্ষয় নাহি হবে কখন।
৫. অতি দীনহীনের এই বচন, শুন ওরে ভোলা মন,
ধর খ্রীষ্টের চরণ,
ও মন মহাসুখে সুখী হবে, তুমি স্বর্গে পাবে সিংহাসন।

বাউল সুরের গান হিসেবে মহেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তীর সংকলনে গানটি স্থান পেলেও *ধর্মগীত* গ্রন্থে গানটির শিরোদেশে লেখা আছে রামকেলী রাগ ও আড়াঠেকা। গানটির বাণীতে যে ভাবটি ফুটে ওঠে, তাতে বাংলার মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ভক্তিভাবের নিবিড় প্রকাশ খুঁজে পাওয়া যায় আর তা প্রকাশিত খ্রিস্টধর্মের আধারে। খ্রিস্টধর্মে বলা হয়, মানুষ পাপী এবং সকলের পাপ স্খালনের জন্য যীশু খ্রিস্ট ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন। এই গানে বলা হচ্ছে, যীশুকে হৃদয়ে রেখে যত্ন করলে তবেই জীবন সার্থকতা লাভ করবে আর তাঁকে অযত্ন করলে ঘটবে নরকবাস। সাধনা করে যে খ্রিস্টধন লাভ করেছে, অনন্তকাল তার কাছে সেই ধন থাকবে এবং এর কোনো ক্ষয় নেই। এরই দূরতর ফল হিসেবে সাধক স্বর্গলাভ করতে পারবেন।

খ্রিস্টীয় গানের মধ্যে বাংলার আরও যে সমস্ত লোকায়ত ধারার সংগীতের প্রভাব পড়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম ভাটিয়ালি। ভাটিয়ালি হল বাংলার ভাটিদেশের বা নদীমাতৃক অঞ্চলের গান। ভাটিয়ালির সঙ্গে নদীর নিবিড় যোগ আছে। প্রধানত নদীর বুকেই নদীকে জীবনের গভীর দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে ভাটিয়ালি গান গেয়ে থাকেন গায়ক। নদীতে উজান বেয়ে যখন নৌকা নিয়ে যেতে হয়, তখন মাঝি মাল্লারা যে গান গেয়ে নৌকা চালনায় উদ্দীপনা সঞ্চার করেন, তা সারিগান। কিন্তু ভাটিয়ালি বলতে বোঝায় এমন গান, যা ভাটার স্রোতে নৌকা ভেসে যাওয়ার সময় উদাস মাঝি গেয়ে ওঠে। আশুতোষ ভট্টাচার্য ভাটিয়ালি সম্পর্কে লিখেছেন—

> "কর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমবেত সঙ্গীতটিকে প্রধানত সারি শ্রেণীর গান বলিয়া নির্দেশ করা যায়, নিঃসঙ্গ অবসরের একক সঙ্গীতই ভাটিয়ালি নামে পরিচিত।"[৬]

বাউল গান যেমন মরমীয়া গান, ভাটিয়ালিও তেমনই বাংলার এক মরমীয়া গানের ধারা। সমাজে সংগীতের মাধ্যমে মানুষ যে শুধুই ধর্মের কথাই উচ্চারণ করেছে এমন নয়; নদীপ্রধান বাংলাতেও এমন লোকায়ত গান আছে, যেখানে মানুষ নিজের কথা, প্রেম-প্রীতি, আনন্দ-বেদনার কথা প্রকাশ করেছে। ঈশ্বরচিন্তার প্রাধান্য সেখানে থাকে না, বরং জীবনের কথা বলতে গিয়ে জন্ম নেয় জীবনকেন্দ্রিক গভীর দর্শনের কথা, আর সেই সূত্রেই চলে আসে আধ্যাত্মিকতাও। বাংলার ভাটিয়ালি গান এমনই এক লোকগান।

ভাটিয়ালি গান একক সংগীত, কোনো সঙ্গীর, এমনকী কোনো যন্ত্রের অনুষঙ্গও প্রাথমিকভাবে এই গানে ছিল না। গায়ক সম্পূর্ণ নিজের একান্তের অবসরে গান গেয়ে যায়। অনুমিত হয় যে, আধ্যাত্মিকতা ভাটিয়ালি গানে প্রথমদিকে ছিল না। ভাটিয়ালি গানের আধার মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদিই। অর্থাৎ পার্থিব জীবনই ভাটিয়ালি গানের উপজীব্য। অবসর সময়ে এই একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনা ও অনুভূতির রোমন্থন করতে করতে এই গায়কদের মনে হয়তো ছোট ছোট ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে বহুবিধ ভাবনা, জীবনদর্শন, আধ্যাত্মিকতার উদ্ভব ঘটে, সেই সূত্রেই ব্যবহৃত হয় 'মনমাঝি', 'জীবনতরী' ইত্যাদি রূপক। এর থেকেই ভাটিয়ালি গানের মধ্যে মিস্টিসিজম, দেহাত্মবাদ, মরমীয়াবাদের আবির্ভাব। অতএব, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ভাটিয়ালি গান মূলত একধরনের ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) গান এবং এর মধ্যে যে দার্শনিকতার আগমন ঘটেছে, তা একান্তই জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত; কোনো বিশেষ ধর্মের সঙ্গে এর যোগ নেই।

খ্রিস্টসংগীতের ক্ষেত্রে যখন ভাটিয়ালি প্রসঙ্গ আসে, তখন যে সবসময় গানের কথায় ভাটিয়ালির মতোই গানের বাণী থাকে এমন নয়। বাউল গানের মতো খ্রিস্টীয় ভাটিয়ালির ক্ষেত্রেও গানে দার্শনিকতার চেয়ে সুরের বিশেষত্বের প্রতিই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 468 - 477
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

লক্ষ্য বেশি ছিল বলে মনে হয়। পূর্ববঙ্গের নদীর যে উদাস সুর, নদীতে ধীরে, স্রোতের অনুকূলে চলার সময় বৈঠার ওঠা-পড়ার ছন্দে বাঁধা খ্রিস্টীয় গানই প্রধানত খ্রিস্টীয় ভাটিয়ালি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভাটিয়ালি গান গাইবার সময় যন্ত্রের ব্যবহার ছিল না। কিন্তু লোকসংগীতের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন অনুসারে নিজের প্রকৃতিকে বা বিশেষত্বকে বদলে নেওয়া অথবা ব্যতিক্রমকে গ্রহণ করা। ভাটিয়ালিতে লোকগানের এই বিশেষত্ব অনুসারেই বর্তমানে কিছু কিছু লোকযন্ত্র ব্যবহৃত হয় এবং এই যন্ত্রগুলি থেকেই ভাটিয়ালি গানে নদীতে নৌকার বৈঠার ছন্দ খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলায় মৌলিক খ্রিস্টসংগীত রচনা শুরুর এক শতাব্দীর মধ্যে—অর্থাৎ উনিশ শতকে এমন কিছু খ্রিস্টীয় গান রচিত হয়েছে, সংগীত সংকলনে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে কোনো শাস্ত্রীয় রাগে বা তালে নিবদ্ধ গান হিসেবে, কিন্তু বর্তমানে তার যে শ্রাব্যরূপ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আছে লোকসংগীতের আদল—কিছুটা ভাটিয়ালি, কিছুটা বাউল গানের ধরন। একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যায়। ১৮৯২ সালে রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন একটি খ্রিস্টীয় গান, যেটি *ধর্মগীত* গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে 'খ্রিস্টীয় জীবন' পর্যায়ের গান হিসেবে। গানের শিরোদেশে উল্লেখ করা হয়েছে গানটি 'ঝিঁঝিট-ঠুংরি' বলে। গানটি হল—

যীশুর আলো, কি উজ্জ্বল, দেখাই খুলে প্রাণ কারে,
(দেখ)মসূর্য লাগে কোথায়, তাঁর আলোর কাছে সব হারে।
ঐ আলো মোর অন্তরে। ভাল মন্দের বিচার করে,
(তাই) সদা জেগে থাকি আমি, নির্ভর যীশুর উপরে।
এত জ্ঞান যীশুতে পাই, ভাষা নাহি সে সব বুঝাই,
(তাই) যীশুর গান আপনি গাই, যীশুর আলোয় তান ধরে।
ভক্ত সকল সাবধান হও, যীশুর আলোয় প্রাণ মিলাও,
(সদা) চল, মাঝে থেম নাক, সর্ব পূর্ণতার তরে।

গানটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শিল্পী সনজিৎ মণ্ডলের কণ্ঠে শোনা যায় এবং এর গায়নে, সুরে ও ছন্দে ভাটিয়ালির ধরনটি স্পষ্ট। স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন তৈরি হয় যে, গানটি রচনার অব্যবহিত পরে ঠুংরির চালে গাওয়া হত নাকি ভাটিয়ালির ধরনটি তাতে প্রকাশিত ছিল।

খ্রিস্টীয় ভাটিয়ালি গানের শিরোদেশে কোনো শাস্ত্রীয় রাগের উল্লেখ থেকে থাকলেও তাতে যেমন ভাটিয়ালি সুরের উপস্থিতি অনুভব করা যায়, তেমনই খ্রিস্টীয় ভাটিয়ালি গানের আরও এক ধরন আছে, যেখানে খ্রিস্টসংগীত সংকলনগুলিতে 'ভাটিয়ালি সুর' বা 'ভাটিয়ালি' উল্লেখ করে দেওয়া থাকে। ১৯৫০ সালে প্রিয়নাথ বৈরাগী নামক একজন খ্রিস্টসংগীত রচয়িতা একটি ভাটিয়ালি গান রচনা করেছিলেন, যেটি *ধর্মগীত, নূতন গীতি, নতুন ধর্মগীত*— এই সংকলনগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে। গানটি হল—

আনন্দে বন্দী দীনবন্ধু তোমার রাঙা পায়;
আমি গাব তোমার ঐ যীশু নাম, আমার দেহে যাবৎ জীবন রয়।
১. দিয়ে দেখা দুঃখের দুর্দিনে, তুমি করলে উদ্ধার এ অধীনে আপন গুণে।
তুলে বসালে এই কাঙালে তোমার চরণে,
(আমি) ভুলিব না এই করুণা, কভু ভুলিব কেমনে হায়।
২. এই ভিক্ষা আজ মাগে দীনহীন,
তোমার ঐ পাদপদ্মে চিত্ত যেন নিত্য থাকে লীন,
করি আকিঞ্চন ওহে ত্রাণধন মনে নিশিদিন,
আমার ফুরাইয়া যাক সকল আশা, যেন এ আনন্দ না ফুরায়।

এই গানটির সুর হিসেবে বইতে ভাটিয়ালির উল্লেখ থাকলেও এর যে শ্রাব্যরূপটি বর্তমানে পাওয়া যায়, তাতে বাউল গানের সুরের আভাস বিদ্যমান।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 468 - 477
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাংলায় আদিযুগ-মধ্যযুগে ধর্মীয় কাব্য ও সংগীতে কবি বা পদকর্তারা নিজেদের নাম বা পরিচয় ভণিতা আকারে রেখে দিতেন। বাউল ও মরমীয়া গানেও তার উপস্থিতি পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় বাউল গানের প্রসঙ্গে আলোচনা যেমন দেখা গেছে খ্রিস্টীয় তত্ত্ব বাউল গানে অথবা পাল্লাগান ব্যতীত বিচ্ছিন্নভাবে রচিত খ্রিস্টীয় বাউল গানে সংগীত রচয়িতা ভণিতা রেখেছেন, ভাটিয়ালি গানেও তেমন ভণিতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু ভাটিয়ালি গান এক ধরনের লোকসংগীত। যে গানগুলি মানুষের ব্যক্তিগত আবেগ, জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে রচিত, তাতে ভণিতা ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। ভাটিয়ালি গান এমনই ব্যক্তিজীবনের গান। তাই সংগীত রচয়িতার ভণিতা এই গানে সাধারণভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। সম্ভবত একেবারেই ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশক বলে গানগুলিতে নিজের পরিচয় দিতে রচয়িতারা উৎসাহ বোধ করতেন না, যেখানে ধর্মকেন্দ্রিক গান বা কাব্যে রচয়িতা বলছেন ঈশ্বরের কথা এবং তাতে তাঁদের দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে, সেখানে ভণিতা রেখেছেন সংগীত রচয়িতারা। উক্ত খ্রিস্টীয় ভাটিয়ালিটির ক্ষেত্রেও এই বিষয়টিই হয়তো সংগীত রচয়িতার ভণিতা রাখার কারণ হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলা ধর্মীয় গান বা ভক্তিসংগীতে ভণিতা ব্যবহৃত হলেও বাংলা মৌলিক খ্রিস্টসংগীতে ভণিতা সংগীত রচয়িতারা রাখতেন না। যেখানে বাংলা ধর্মসংগীতে ভণিতা একেবারে গোড়ার দিকের মূলগত বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল, সেখানে খ্রিস্টসংগীত ছিল ভণিতা বর্জিত। সম্ভবত, বাংলা ধর্মীয় গানের এই বিশেষ স্বাতন্ত্র্য খ্রিস্টসংগীতের মধ্যে এনে একে বাংলা চিরাচরিত ধর্মানুষঙ্গযুক্ত গানের পর্যায়ে রাখতে রচয়িতাদের মধ্যে কেউ কেউ এই গানে ভণিতা রেখেছেন, যাঁদের মধ্যে আছেন ললিতমোহন সরকার।

খ্রিস্টীয় ভাটিয়ালিতে সুরের মধ্যে ভাটিয়ালির বিশেষত্ব ধরা থাকে যেমন, তেমনই কখনো খ্রিস্টসংগীতে ভাটিয়ালি গানের বিষয়গত সাদৃশ্যও মেলে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ললিতমোহন সরকারের পূর্বোক্ত বাউল গানটিতে ভাটিয়ালি গানে ব্যবহৃত রূপক ও প্রতীকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ফলত, ভাটিয়ালি পরিচয় না থাকলেও তার প্রতীক বা রূপকের ব্যবহার বজায় রেখেছেন খ্রিস্টবাউল সংগীত রচয়িতা নির্দ্বিধায়। পাশাপাশি *ধর্মগীত* গ্রন্থের ২৯৭ সংখ্যক গান ‘ধ্যান ও প্রার্থনা’ পর্যায়ভুক্ত একটি ভাটিয়ালি গান। গানটিতে ভাটিয়ালির প্রচলিত বেশ কিছু শব্দবন্ধ পাওয়া যায়। গানটি হল—

আমার জীবন পথের আলো যীশু, সাথে সাথে চল।
গহন বনে একলা যেতে, পথ যে না পাই কোনমতে,
আমার জীবন পথ-দর্শক যীশু! পথ দেখিয়ে চল।
সাথীরা সব যায় যে ফেলে, আঁধার ঘিরে এলো,
ব্যথার ব্যথী যীশু এসো, নইলে এ প্রাণ গেলো,
আমার জীবন পথের সম্বল যীশু! হাত ধরে নিয়ে চলো।
জীবন নদীর তুফান ঝড়ে, হাল ভেঙ্গে যায় পাল যে ছেঁড়ে,
যীশু মাঝি বস হালে, নইলে তরী ডুবলো,
আমার জীবন তরীর মাঝি যীশু! হাল ধরে নিয়ে চলো।

এই গানের বিষয়বস্তুও জীবনের নানা প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তির উপায় যীশুই। জীবনতরী তুফানের কবলে পড়লে যূশুই তার মাঝি হয়ে তা পার করে দেবেন। গানটিতে ‘নদীর তুফান ঝড়’, ‘জীবনতরী’, তার ‘মাঝি’, ‘হাল’ — এই বিষয়গুলি একেবারেই ভাটিয়ালি গানের নদীবিষয়ক রূপক। অতএব, এই গানে সুরের সঙ্গে সঙ্গে মূল বিষয়বস্তুকেও ভাটিয়ালি গানের বাণীর সঙ্গে মিলিয়েছেন গীত রচয়িতা। পূর্বে উল্লেখিত ললিতমোহন সরকারের রচনা করা খ্রিস্টীয় বাউল গানেও পাওয়া গেছে নানা ভাটিয়ালি অনুষঙ্গ — যেমন, মাঝি, তরী, ভবনদী ইত্যাদি। ফলে বোঝা যায় যে, বাংলায় খ্রিস্টীয় লোকসংগীতের ক্ষেত্রে সংরূপগুলির মধ্যে খুব পার্থক্য নির্ধারণের অবকাশ নেই। সাংগীতিক প্রকরণগুলি একে অপরের সঙ্গে খুব নিকট সম্পর্কে জড়িত।

মহেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তীর *খ্রীষ্ট-সঙ্গীত* সংকলনে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের উল্লেখ আছে ‘ভাটিয়াল-কাওয়ালি’ পরিচয় দিয়ে। উল্লেখ্য, গানটি একটি ব্রহ্মসংগীত। গানটি হল—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 468 - 477
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তোমারি নাম বলব নানা ছলে,
বলব একা বসে আপন মনের ছায়াতলে॥
বলব বিনা ভাষায়, বলব বিনা আশায়,
বলব মুখের হাসি দিয়ে, বলব চোখের জলে॥
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পূরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে॥

এই গানে ভাটিয়ালি গাইবার ধরন বা চলনে সাদৃশ্য কিছুই নেই; এমনকী রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে ভাটিয়ালি অঙ্গের গান হিসেবে কোনো গানকেই অভিহিত করা হয় না। সেখানে বিশ শতকের গোড়ার দিকে — বিশেষত রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রকাশিত এই খ্রিস্টসংগীত সংকলনে গানটির 'ভাটিয়াল' আখ্যালাভ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই গান রচিত হয়েছিল ১৯১৩ সালে। সমকালে বাংলার অন্যান্য গীতরচয়িতার ভক্তিমূলক গানে নদী বা তরী প্রসঙ্গ আসলেও রবীন্দ্রনাথ এই ভাটিয়ালির অনুষঙ্গগুলির কোনোটিই 'তোমারি নাম বলব' গানটিতে না রেখেও তা সংকলক 'ভাটিয়াল' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আসলে বাংলায় খ্রিস্টসংগীতের ধারায় যে যে গানের প্রভাব এসে পড়েছে, দেখা যায়, তাদের প্রভাব সবসময়ই মিশ্র। বাউল গানের সঙ্গে একেবারে আধুনিক যন্ত্রানুষঙ্গের ব্যবহার ও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে জনপ্রিয় হয়ে পড়া রংবাউলের গায়নশৈলী খ্রিস্টীয় বাউল গানে গৃহীত হয়েছে। অপরদিকে, ভাটিয়ালি গানের কথার সঙ্গে ভাটিয়ালি সুরের বা ধাঁচের খ্রিস্টসংগীতের দার্শনিক সাদৃশ্য এককথায় নেই বললেই চলে। সেখানে যখন এই গানে ব্যবহৃত রূপকের কিছু কিছু খ্রিস্টসংগীতে ব্যবহৃত হয়, তখন দেখা যায় যে, এই ধর্মের গানে বাংলার সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি ঘটছে কোনো নিয়ম ব্যতিরেকে। সেই কারণে কোনো খ্রিস্টীয় গানে উল্লেখিত সুর বা রাগ-তালের সঙ্গে তার গীতরূপের পার্থক্য খুবই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। একেবারে শাস্ত্রীয় রাগে নিবদ্ধ গান প্রচলিত হয়ে গেছে লৌকিক সুরে, আবার একটি বিশেষ লৌকিক সুরে নিবদ্ধ গানে এসে পড়েছে অন্য ধারার লোকসুর। বস্তুত, বাঙালির কাছে যে ধরনের গান বেশি পরিচিত এবং যে সুরের সঙ্গে তাঁদের আবেগের যোগ, তার সুরে সৃষ্ট খ্রিস্টসংগীত অনেক বেশি আপন ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। বাংলা খ্রিস্টসংগীতের এই বৈচিত্র্যেরই প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায় বাউল ও ভাটিয়ালি খ্রিস্টসংগীতগুলির মধ্যে।

Reference:

১. S.J., H. Hosten. 'The Three First-Type Printed Bengali Books'. *Bengal Past & Present* July-September 1914: 40-63, P. 46
২. ঝা, শক্তিনাথ. *বস্তুবাদী বাউল.* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃ. ৩৯২
৩. তদেব, পৃ. ৩৯২
৪. তদেব, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. *বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড.* নিয় দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমী, ২০১৬, পৃ. ১২৫২
৬. ভট্টাচার্য, আশুতোষ. *বঙ্গীয় লোক-সংগীত রত্নাকর চতুর্থ খণ্ড.* কলকাতা: এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাঃ লিমিটেড, ১৩৮৩, পৃ. ১৫৮৩